তারিখ 9 MAY 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং ....
তারিখ ....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি, এন্ড পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি. এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর

মো. শহীদ উল্লা খন্দকার

নিভৃতচারী এক বিজ্ঞানসাধক

রাজনৈতিক বলয়ে থেকেও বিজ্ঞানী হিসেবে নিজের গবেষণা নিয়ে আলাদা জগৎ তৈরি করেছিলেন যিনি, তিনি আমাদের প্রয়াত ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া। বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ধাপ পরমাণু নিয়ে স্বপ্ন দেখার মতো কাজটি তিনি করে গেছেন। বাংলাদেশের আণবিক পাওয়ার প্লান্টের এই স্বপ্নদ্রষ্টা আজ আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই পরমাণুবিজ্ঞানী নানাভাবে বাঙালি জাতির পরম আপনজনে পরিণত হয়েছিলেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করে বাংলাদেশকে প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিকভাবে উন্নত দেশে পরিণত করার এক স্বপ্ন ছিল তাঁর, যা তিনি তাঁর জীবন ও কর্মে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন আমাদের। এই মহান বিজ্ঞানসাধকের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী আজ। ২০০৯ সালের ৯ মে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৬৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই পরমাণুবিজ্ঞানী তাঁর জীবদ্দশায় আন্তরিকতা, প্রতিভা ও মানবিক গুণাবলি দিয়ে চারপাশের মানুষকে যেমন মুগ্ধ করেছেন, তেমনি ভালোবাসা ও দেশপ্রেম দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে জাতির জন্য কাজ করে গেছেন। জাতির জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার জন্য ড. ওয়াজেদ মিয়া সবার জন্য আদর্শ হয়ে থাকবেন এবং তাঁর অবদানের জন্য মানুষ তাঁকে চিরকাল স্মরণ করবে।

১৯৪২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার ফতেহপুর গ্রামে জন্ম নেওয়া এই বিজ্ঞানসাধক ছাত্রজীবনেও তুখোড় মেধাবী ছিলেন। মেধার কারণে তিনি একের পর এক সাফল্যের সঙ্গে সকল শিক্ষা বৈতরণী পার হন। তাঁর জীবনের দিকে দৃষ্টি নিপতিত করলে দেখা যায়, মেধাবী ছাত্র বা পরমাণুবিজ্ঞানীর বাইরেও অনেক গুণবাচক শব্দ ধারণ করেছিলেন তিনি, যা আমাদের এক মুগ্ধতার আবেশে তাঁকে নিয়ে ভাবতে উজ্জীবিত করে। তিনি ছিলেন নির্লোভ, নিভৃতচারী, নীতিবান, নিরহংকার, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, দৃঢ়চেতা, দেশপ্রেমিক, আদর্শবান, সৎ, সহজ-সরল, বিনয়ী, চরিত্রবান, যুক্তিবাদী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন আদর্শ মানুষ। এত গুণে গুণান্বিত

[স্মরণ]

ড. ওয়াজেদ মিয়া সাতটি পাঠ্য বই লিখেছেন। এর মধ্যে ছয়টি এরই মধ্যে প্রকাশিত। মৃত্যুর আগে সপ্তম বইটির সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। দেশের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা প্রসারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। ড. ওয়াজেদ মিয়া মনে করতেন, সমাজে বিজ্ঞানীদের যথাযথ অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে বিজ্ঞানীদের আগে নিজেদের কাজ করে যেতে হবে। তার পরই শুধু জনগণের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যেতে পারে

মানুষ কয়জন আছেন এই ভুবনে!

ওয়াজেদ মিয়া মেধাবী হিসেবে ছোটবেলাতেই শিক্ষকদের দৃষ্টি কাড়েন। ১৯৫৬ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৮ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। সে বছরই ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে। ছিলেন ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র। সে সময়ই ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা। ফজলুল হক মুসলিম হলের ভিপিও নির্বাচিত হন তিনি ১৯৬১-৬২ শিক্ষা বছরে। তখনই বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে আসেন ওয়াজেদ মিয়া। ১৯৬১ সালে স্নাতক, ১৯৬২ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেন তিনি। ১৯৬৩ সালের ৯ এপ্রিল তিনি তৎকালীন পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনে যোগ দেন। এরপর ১৯৬৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ডারহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিউক্লিয়ার অ্যান্ড হাই এনার্জি পার্টিক্যাল ফিজিকসে পিএইচডি করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে নিউক্লিয়ার ল্যাবরেটরিতে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা ছাড়াও ইতালির ট্রিয়েসটের আন্তর্জাতিক তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে একাধিকবার গবেষণা করেছেন। ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত তিনি তৎকালীন পশ্চিম জার্মানির কার্লসরুয়ে শহরের আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে আণবিক রিঅ্যাক্টর বিজ্ঞানে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ১৯৭৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তিনি ভারতের আণবিক শক্তি কমিশনের দিল্লি ল্যাবরেটরিতে গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যা ট্র্যাজেডির পর গোটা পরিবারের হাল ধরেন ওয়াজেদ মিয়া। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত নির্বাসিত জীবনে ভারতীয় পরমাণু শক্তি কমিশনের বৃত্তির টাকায় সংসার চালিয়েছেন তিনি। সর্বশেষ চাকরি করেছেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে। ১৯৯৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন চাকরি থেকে।

বিজ্ঞান সাধনায় নিবেদিত থাকলেও সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে একেবারেই সরে যাননি তিনি। তিনি ঢাকার রংপুর জেলা সমিতির আজীবন সদস্য ও ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত দুই বছর মেয়াদকালের জন্য ওই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ও ঢাকায় বৃহত্তর রংপুর কল্যাণ সমিতি, উত্তরবঙ্গ জনকল্যাণ সমিতি, রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন ফোরাম, জাতীয় সমন্বিত উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, বেগম রোকেয়া স্মৃতি সংসদ ও রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার মির্জাপুর বছিরউদ্দিন মহাবিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকার বিক্রমপুর জগদীশচন্দ্র বসু সোসাইটি তাঁকে ১৯৯৪ সালে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু স্বর্ণপদক ও ম্যাবস ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা ১৯৯৭ সালে পদক প্রদান করে।

ড. ওয়াজেদ মিয়া সাতটি পাঠ্য বই লিখেছেন। এর মধ্যে ছয়টি এরই মধ্যে প্রকাশিত। মৃত্যুর আগে সপ্তম বইটির সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। দেশের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা প্রসারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। ড. ওয়াজেদ মিয়া মনে করতেন, সমাজে বিজ্ঞানীদের যথাযথ অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে বিজ্ঞানীদের আগে নিজেদের কাজ করে যেতে হবে। তার পরই শুধু জনগণের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যেতে পারে। তিনি পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার দ্বারা নিজস্ব একটি পরিচয় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ জন্যই অন্য পরিচয়গুলো তাঁর জন্য অলংকার। যেসব কথা তিনি প্রচার করতে চাননি, তার প্রয়োজনও বোধ করেননি। মৃত্যুর আগে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সম্পর্কে দেশবাসী যতটা জানতেন, মৃত্যুর পর জেনেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি।

লেখক : সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার